

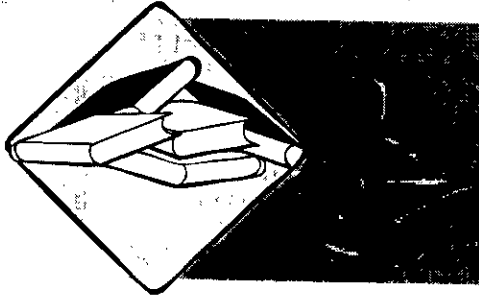
এ শিক্ষা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

ইন্দ্রজিত ভৌমিক

সাত সকালে পূর্বাকাশে সূর্যমাসা উঁকি দেয়ার অনেক আগেই মহানগরীর কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। বৈদ্যুতিক তারের উপর বসে থাকা কাকগুলো প্রথমবার কা' করে ওঠার আগেই শশব্যস্ত মায়েরা বইপত্রের পসরা সাজিয়ে বের হয়ে পড়েন সন্তানকে নিয়ে। লক্ষ্য ঘুম তুলতুলু চোখে রিমুতে থাকা সন্তানটিকে সময়মত স্থলে রেখে আসা। ব্যস্ত নগরীর এটা প্রতিদিনের রুটিন। এছাড়া সন্তানকে স্কুল-কলেজে ভর্তি করানো তো আছে, সঙ্গে যুক্ত হয় প্রাইভেট কিংবা কোচিং-এর বাড়তি চাপ। যদি প্রশ্ন করা হয় মায়েরা এমন অমানবিক রুটিন-পরিগ্রহ কেন করছেন, বাবারা তাদের রক্ত জল করা শ্রমে আয়করা অর্থ কিসের পেছনে ব্যয় করছেন? সব প্রশ্নের সহজ উত্তর সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা। কিন্তু পরক্ষণেই যদি প্রশ্ন করা যায় এ ভবিষ্যৎ কি শুধুই পরীক্ষার ভালো ফল অর্জনের ওপর নির্ভরশীল? তখন অনেকই নীরব হয়ে যেতে বাধ্য। তারপর কেউ কেউ মুখ ফসকে বলেও দিতে পারেন এটা আমার ছেলে-মেয়ের এ প্রাস পাওয়ার জন্য। কেউ যদি প্রশ্ন করেন এ প্রাস পেলে কী হবে? যদি এ প্রাস না পায় তবে কী হবে? এক্ষেত্রে মা-বাবার ঢালাও বিশ্বাস এ প্রাস প্রাপ্তি সোনালী ভবিষ্যতের হাতছানি, আর এ প্রাস প্রাপ্তির ব্যর্থতা মূর্তিমান এক ধ্বংসাত্মক হাতছানি। বাস্তবে সন্তানদের এমন অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যাচাইয়ের মূল মানদণ্ড ভালো ফলাফল হয়ে যাওয়াতে। এখানে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবন কোনো কল-কারখানার যন্ত্রাংশ থেকে ভিন্ন কিছু নয়। সবাই এখানে দৌড়াচ্ছে ভালো ফলের পেছনে, ছুটে ছুটে ক্রান্ত শিশুরা ভয়ে কেউ কেউ জীবন থেকে ছুটি নিয়ে ফেলেছে বিরক্তি ভরে। তারপরও মা-বাবার প্রত্যাশার কন্ঠ নেই। সমাজ তাদের কী দায়িত্ব দিয়েছে, মানুষ হতে গেলে কী করতে হবে পাশাপাশি আরো নানা বিষয় নিয়ে তাদের চিন্তার সুযোগ কোথায়? তাদের দৌড় এক ভালো ফলাফলের পেছনে আর এটা করতে গেলে পেতে হবে অনেক নশ্বর। প্রয়োজনে গোপনে

বের করে আনতে হবে প্রশ্নপত্র। তারপর মুখস্থ করে, অন্যেরা দেখে উত্তরপত্রে টেলে দিলেই কেলা ফতে। নীতি-নৈতিকতার এখানে কোনো স্থান নেই। আর এভাবে চলতে গিয়ে বাস্তবে এক খাদের কিনারে গিয়ে, দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা।

বেশ কিছুদিন আগে দেশের 'শিক্ষা ব্যবস্থার মান' নিয়ে প্রশ্ন তুলে একটি বেসরকারি টেলিভিশনে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।



প্রতিবেদনটি প্রকাশের পরই এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুরু হয় তর্ক-বিতর্ক। প্রতিবেদক জিপিএ-৫ পাওয়া ১৩ জন শিক্ষার্থীকে কিছু প্রশ্ন করার মাধ্যমে বর্তমান শিক্ষার ব্যবস্থার সার্বিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রতিবেদক এবং প্রতিবেদনটি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক থাকলেও মনে করি প্রতিবেদনে ফুটে উঠা শিক্ষার করুণ দশা সম্পর্কে সচেতন মহলে বিতর্ক নেই। জিপিএ এবং এসএসসি-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ কী, শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধের অবস্থান কোথায়, অপারেশন সার্চ লাইট কী, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস কবে, স্বাধীনতা

দিবস ও বিজয় দিবস কবে, মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল— প্রতিবেদকের এমন অতি সাধারণ প্রশ্নে জিপিএ-৫ পাওয়া ১৩ জন শিক্ষার্থী যে উত্তর দিয়েছেন তা খুবই হতাশাজনক। যদিও লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর অর্জন মাত্র ১৩ জন শিক্ষার্থী দিয়ে বিচার করা যায় না। তবে এ ১৩ জন যে উত্তর দিয়েছে তা আর কিছু নয়, জাতির হতাশার গ্রহর দীর্ঘায়িত হওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত বটে।

শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ ও সৃজনশীল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার ২০০৮ সালে উন্নত বিশ্বের প্রশ্নপত্রের ধারণায় সনাতন প্রশ্ন পদ্ধতি বাদ দিয়ে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করে। প্রথম বছর পরীক্ষামূলকভাবে সাধারণ শিক্ষায় এসএসসি পর্যায়ে এটা চালু করা হয়। পরে তা মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষায়ও প্রয়োগ করা হয়। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের জন্য সরকার আইন করে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের নোট বই মুদ্রণ, বাঁধাই, প্রকাশনা, আমদানি, বিতরণ ও বিক্রি নিষিদ্ধ করে। উচ্চ আদালতের এক রায়ে গাইড ও নোট বই মুদ্রণ ও বাজারজাত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। গৃহীত এ সকল পদক্ষেপ যুগোপযোগী এবং প্রশংসনীয়ও বটে। তবে লক্ষ্যীয় বিষয় হচ্ছে— নোট বা গাইড বই মুদ্রণ ও বাজারজাত নিষিদ্ধ করা হলেও বইয়ের দোকানগুলোতে অনেকটা প্রকাশেই নোট বা গাইড বই বিক্রি করা হয়।

তাছাড়া পরীক্ষায় নোট বা গাইড থেকে প্রশ্ন করা হলে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বইয়ের উপর আগ্রহ হারিয়ে নোট বা গাইডের উপর নির্ভরশীল হবে। জাতির জন্য যা হবে অপূরণীয় ক্ষতি। শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে, বিফলে যাবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষাখাত নিয়ে কোনোভাবেই ছেলেখেলা করা যাবে না।

লেখক: শিক্ষার্থী, ইতিহাস বিভাগ, স্নাতকোত্তর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়